নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ

নিবন্ধ

নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ

হিটলারের পুনর্জন্ম

নির্মলেন্দু গুণ

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকাল সোয়া আটটায় আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা নগরীতে তাদের নব-আবিষ্কৃত পরমাণু বোমা 'লিটল বয়'-এর বিস্ফোরণ ঘটায়। আমার জন্মের ঠিক এক মাস ষোল দিনের মাথায় মানব-সভ্যতার ইতিহাস-কাঁপানো এই চরম-বর্বর বা ইতিহাসের এযাবৎকালের বর্বরতম ঘটনাটি ঘটায় আমি খুব বিব্রত বোধ করি। ভাবি, মানব-সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসের এই 'পরাবর্বর' (পরমাণু বোমার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমি এই নতুন শব্দটি আজই তৈরি করলাম) অপরাধটি সংঘটিত হলো কি না, বেছে বেছে ঠিক আমার জন্মের বছরটিতেই। আহা, আমি কি অপয়া তবে?

অনেকেই বলতে পারেন, কেন ঐ বছরটি খারাপ কিসে? আপনি নিজেকে অপয়া ভাবছেন কেন? ঐ বছরটি তো খুবই পয়মন্ত একটি বছর। ঐ বছরই তো অবসান হয়েছে প্রায় অর্ধযুগ ধরে প্রলম্বিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। বর্বর অক্ষশক্তির (জার্মানি, ইতালি ও জাপান) ঐতিহাসিক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে মিত্রশক্তির (আমেরিকা, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) প্রত্যাশিত বিজয়। তা না হলে এই চিরমনোরম পৃথিবী যে রসাতলে যেতো। হিটলার-মুসোলিনি-তোজো চালিত অশুভ চক্রের হাত থেকে এই বিশ্বকে রক্ষা করেছে রুজভেল্ট-ট্রুম্যান-চার্চিল-স্ট্যালিন পরিচালিত শুভ চক্র, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর বর্তমান বিশ্বে এখন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ইঙ্গ-মার্কিন পরাচক্র হিসেবে প্রদীপ্যমান।

আমি তাদের চিন্তার সঙ্গে একমত হতে পারলে খুবই খুশি হতে পারতাম। কিন্তু প্রথমত জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির লক্ষাধিক নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে পরমাণুবোমার আঘাতে হত্যা করে, দুটি নগরীকে আক্ষরিক অর্থেই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয় অর্জিত হয়েছে, তা কোনোভাবেই আমার কাছে সমর্থনযোগ্য মনে হয়নি। এর মধ্যে মিত্রশক্তির বীরত্ব তো নয়ই, বরং তার মধ্যকার বর্বরতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে, যা অক্ষশক্তিকৃত যাবতীয় অপকীর্তিকে ম্লান করে দেয়ার জন্য যথেষ্টরও অধিক।

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবমুক্ত আমার জন্ম-পরবর্তীকালের ইতিহাস আমাকে খুব খুশি হওয়ার সুযোগ দেয়নি। দুইশত বছরের পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেয়ে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে

ভারতের খন্ডীকরণ, বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আমার মতো ধর্ম-নির্ধারিত সংখ্যা বিচারে যারা লঘু–, তাদের জীবনে সাম্প্রদায়িক-পরাধীনতার এক নবযুগের সূচনা করে। যার মূল্য আমার মতো, জানি আরও অনেককেই দিতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে ছিন্ন হয়ে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে জন্মগ্রহণ করা বাংলাদেশ দ্বিজাতিতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তিটাকে কিছুটা নড়বড়ে করতে পারলেও, তা খুব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার মধ্য দিয়ে এমন এক নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে, যা দর্শনগতভাবে সাম্প্রদায়িক। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ পুরনো ইতিহাসে তার কাজ চলবার কথা নয়। তাই নতুন বাংলাদেশের চাহিদা পূরণে প্রণীত হয়েছে নতুন ইতিহাস। এটাই স্বাভাবিক। বিকৃত দর্শন কখনও অবিকৃত ইতিহাসের মধ্যে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে না। তাই জাতির সামনে নতুন ইতিহাস উপস্থাপন করাটা তখন জরুরি হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী ও তাদের সমর্থকরা গত ষাট বছর ধরেই ঐ মহাযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করে চলছে। ইতিহাস রচনা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ের গৌরব অর্জনের পাশাপাশি চার্চিল সাহেব তো নোবেল পুরস্কারটি পর্যন্ত বাগিয়ে নিয়েছেন। ব্যক্তি হিসেবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

tbZvRx mfvI P›` emi Ave¶ gwZi cv‡k

সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি চার্চিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তিনি একদিকে স্যার উপাধিতে ভূষিত হন ও ১৯৫৩ সালে সহিত্যে নোবেল পরস্কার লাভ করেন। যুদ্ধবাজ হেনরি কিসিঞ্জারের শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনাটির কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

হিটলারের নাৎসি বাহিনীর অত্যাচারের অজস্র রোমহর্ষক কাহিনী শুনে শুনে অনেকের মতো আমিও বড় হয়েছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে নিয়ে কতো ছবি, কতো গান, কতো কাব্য, কতো নাটকই না লেখা হয়েছে দেশে দেশে। কতো চলচ্চিত্রই না নির্মিত হয়েছে। এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগর-তীরের দেশগুলোতে দখলদার জাপানিদের বর্বরতার কথাও আমরা জেনেছি আমাদের কবি-সাহিত্যিক-রাজনীতিকদের লেখায়। একসময় অগ্রজ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি নিজেও কিছু কিছু লিখেছি।

কিন্তু হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফাটানোর পরাবর্বর ঘটনাটি ছাড়া বিজয়ী মিত্রবাহিনীর অত্যাচার ও বর্বরতার কাহিনী খুব কমই জেনেছি আমরা। আসলে আমাদের জানতে দেয়া হয়নি। হিটলার-বিরোধী প্রচারমাদকে আচ্ছন্ন ইতিহাসবিদরা মুদ্রার উল্টো পিঠটা কেমন, তা দেখার আগ্রহ মনে হয় হারিয়ে ফেলেছিলেন। বা খুব একটা গা করেননি। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আদর্শিক দুর্বলতার কারণে, একটা প্রগতিশীল ঘোরের ভিতরে হাবুডুবু খেয়েই আমাদের অনেকেরই কাল কেটেছে। কিন্তু অবাধ তথ্য প্রবাহের এই বিশ্বায়ন যুগে আমরা এমন সব তথ্য এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারছি, যেগুলো ইন্টারনেট না হলে আমাদের অনেকের পক্ষেই জানা সম্ভব হতো না। প্লাবনের পর যেমন ভালো ফসল ফলে, সোভিয়েতের পতনের পর তেমনি একসেস টু ইনফরমেশনস সহজ হয়েছে। মন্দের বিপরীতে এটাই আমাদের পাওয়া। এমন বহু তথ্য এখন জানা যাচ্ছে, যা দশ বছর আগেও ছিলো অকল্পনীয়। তা না হলে আমার মতো একজন অগবেষকের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি কৃত অপরাধের চিত্র পাঠকের দরবারে তুলে ধরা সম্ভব হতো না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তীকালে হিটলার, মুসোলিনি আর গোয়েবলসের কুশপুত্তলিকার আড়ালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মিত্রশক্তির সৈনিকদের দ্বারা সম্পাদিত অপরাধসমূহকে এমনভাবে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিলো যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার পরমাণু বোমা বর্ষণের মতো বড় আপরাধের ঘটনাটিও বিশ্বের অনেক রাজনীতিক-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর চোখে তত বড়ো হয়ে ধরা পড়েনি। অনেকে বুঝতেও পারেননি হিরোশিমা নাগাসাকিতে আসলে কী ঘটেছে। ১৯৪৫ সালে সংবাদ মিডিয়া ছিলো খুবই দুর্বল। আর এটমবোমার সঙ্গে বিশ্ববাসীর পূর্ব-পরিচয় ছিলো না বলে এর ধ্বংসক্ষমতা যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, হয়েছে, তাও বুঝে উঠতে পারেনি অনেকেই। আবার অনেকে বুঝতে পেরেও চেপে গিয়েছেন। ভেবেছেন, এ্যান্ড হ্যাজ জাস্টিফাইড দি মিনস।

আমি আমার বক্তব্যের সমর্থনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমলগ্নে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে থাকা মাওলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মজীবনী 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' থেকে উদ্ধৃত করছি। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার পরমাণু বোমা বর্ষণের খবর ধীরে-ধীরে রাষ্ট্র হওয়ার পর তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, যা তাঁরই অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর বেশকিছুকাল পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

'আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, জাপানের ওপর পরমাণু বোমা ফেলার কোনো যুক্তিই ছিলো না। ... এই ঘটনাটি সারা পৃথিবীকেই শঙ্কিত করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেছিলো– বিশ্বজনমত তখন একবাক্যে জার্মানির নিন্দা করেছে। দানবিকতার জন্য তখন যদি জার্মানিকে ধিকৃত হতে হলো... তো এরচেয়ে জঘন্য অপরাধ করেও আমেরিকা পার পায় কীভাবে? আমি মনে করি জাপানের ওপর পরমাণু বোমা বর্ষণ করে আমেরিকা যুদ্ধে অনুমোদনযোগ্য অস্ত্র ব্যবহারের সীমাকে লঙ্ঘন করেছে, যা তার মিত্রদের সম্মান এবং মিত্রদের বীরত্বের দাবির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। আমি গভীর বেদনার সঙ্গে আরও লক্ষ্য করেছি যে, প্রতিবাদ বা নিন্দা তো দুরের কথা,– মিত্রবাহিনী এই ঘটনাটিকে দুর্দান্ত বিজয় বলে সাধুবাদ জানিয়েছে।'

[ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম : ১২৭ পৃ:]

বাংলাদেশের জন্মপ্রক্রিয়ায় সাহায্য প্রদানকারী মহান সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তো বলাই যায় যে হিটলারের ভবিষ্যদ্বাণী একটু বিলম্বে হলেও ফলেছে। হিটলার ভেবেছিলেন, রাশিয়া আক্রমণ করলে মিত্রশক্তির ঐক্যবলয়ে ফাটল ধরানো যাবে। কেননা, পৃথিবীর প্রথম সাম্যবাদী রাষ্ট্রটির ধ্বংসসাধনে পুঁজিবাদী আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স সবারই কম-বেশি আগ্রহ ছিলো। হিটলার জীবদ্দশায় তাঁর ধারণার সত্যতা দেখে যেতে না পারলেও তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা দেখেছি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান আর স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা এক ও অভিন্ন। অথবা ঘুরিয়ে বলা যায়, স্নায়ুযুদ্ধের শুভ উদ্বোধনের ভিতর দিয়েই যবনিকাপাত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। আর নব্বই দশকের শুরুতে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের লুপ্তির ভিতর দিয়ে,

মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়ার বুশ ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের যৌথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে যবনিকাপাত ঘটেছে কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধের।

আমেরিকা এরকম দাবি করতে ভালোবাসে যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা না ফেললে জাপান আত্মসমর্পণ করতো না। তখন জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান ও মিত্রবাহিনীর সৈন্যকে দুর্ধর্ষ জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ডুবে মরতে হতো। কথাটা হয়তো পুরোপুরি মিথ্যেও নয়। আত্মসমর্পণ না করা কিছু জাপানি সৈন্য এখনও ফিলিপিনসের গভীর অরণ্যে লুকিয়ে রয়েছে বলে জানা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে শেষ হয়ে গেছে, তারা তা জানে না। আসলে জাপানিরা জানতোই না কীভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। যদিও সাম্প্রতিক তথ্য হচ্ছে, জাপানিরা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করে সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিনের কাছে পত্র দিয়েছিলো জাপানের মূল ভূখন্ডে আমেরিকার হস্তক্ষেপের আগেই। অথচ জাপানিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আমেরিকা জাপানের ওপর তাদের পরমাণু বোমার ধ্বংসক্ষমতা কী চমৎকারভাবেই না পরীক্ষা করে নিলো। জাপানিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা বা মিত্রশক্তির অগণিত সৈন্যের জীবন রক্ষার মার্কিন-যুক্তিটা যে কতদূর মিথ্যা, তা বোঝা যায় হিরোশিমা ও নাগাসাকিকে কনভেনশনাল যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে দূরে অক্ষত রাখার মার্কিন সিদ্ধান্ত থেকে। জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োটোকে পূর্বে এটম বোমার লক্ষ হিসেবে বেছে নেয়া হলেও, পরে ঐ নগরীকে অব্যাহতি দেয়া হয় এই বিবেচনা থেকে যে, তাতে জাপানিদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে বেশি। কেননা সেখানে অনেক প্রাচীন ধর্মমন্দির রয়েছে, রয়েছে জাপানিদের প্রিয় রাজার প্রাসাদও। জাপানিদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি মার্কিনীদের এহেন শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা সত্যিই তুলনাহীন। এহেন আমেরিকার পক্ষেই যে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব, সে কথা আর অস্বীকার করবে কে?

হিরোশিমা ও নাগাসাকি ছিলো বিশ্বের জন্য এক প্রচন্ড অশনি সংকেত। কিন্তু মিত্রশক্তির জয়গানে মুখরিত মনীষীরা তখন তা বুঝে উঠতে পারেননি বা বুঝেও না বোঝার ভান করেছিলেন। আমেরিকায় বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসক্ষমতার যে একটা ভয়াবহ মিলন ঘটেছে; আইনস্টাইন বা রবীন্দ্রনাথের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীরাও যে তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি, এটা পৃথিবীর জন্য এক মহা বড় দুর্ভাগ্য।

আইনস্টাইন হিটলারকে বধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই জার্মানি থেকে পরমাণু বোমার ফরমুলাসহ আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমেরিকা যে ঐ শক্তিশেল জাপানের ওপর ফেলবে, তিনি তা ভাবতে পারেননি। এ ব্যাপারে সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ মনীষী বলে বিবেচিত আইনস্টাইনের বক্তব্য শোনা যেতে পারে।

'আমি সবসময় জাপানিদের ওপর বোমা ব্যবহারের নিন্দা করেছি। কিন্তু এই হঠকারী সিদ্ধান্ত ঠেকাতে কিছুই করার ছিল না।'

২৩ জুন, ১৯৫৩ সালে জাপানি দার্শনিক শিনোহারাকে জার্মান ভাষায় লেখা আইনস্টাইনের চিঠি।

kwši i cïZ k×v Rwb‡q wcm wgDwRqv‡g

আমেরিকার আণবিক বোমা তৈরির পেছনে অনেকেই আইনস্টাইনের হাত আছে মনে করেন। আসলে তার ভূমিকার কথা যতটা ভাবা হয়, ততটা কিন্তু নয়। অন্য তিন বিজ্ঞানী লিও ঝালার্ড, ইউজিন ইউগনার এবং এডওয়ার্ড টেলারের প্ররোচনায় তিনি দুটি চিঠি লেখেন রুজভেল্টকে। এর প্রথমটি লেখেন ২ আগস্ট, ১৯৩৯ এবং পরেরটি ৭ মার্চ, ১৯৪০ সালে। তাদের আশঙ্কা ছিল জার্মান বিজ্ঞানীরা বুঝি আণবিক বোমা তৈরির খুব কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। তাদের এ বিশ্বাসের পিছনে অন্য একটি কারণ ছিল। সে সময় জার্মান দখলে থাকা চেকোশ্লোভাকিয়ার খনি থেকে ইউরেনিয়াম বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিল হিটলার। তবে রুজভেল্ট যে আইনস্টাইনের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আণবিক বোমা তৈরির কর্মযজ্ঞের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এমন অকাট্য প্রমাণ এখনো মেলেনি। হিরোশিমা ও নাগাসাকির মর্মান্তিক পরিণতি আইনস্টাইনকে যথেষ্ট মনপীড়া দিয়েছে। আইনস্টাইন যে জাপানের পারমাণবিক বোমা ফেলার বিরুদ্ধে ছিলেন, সাম্প্রতিক সময়ে অবমুক্ত হওয়া কয়েকটি চিঠিতে তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। অবমুক্ত হওয়া চিঠিগুলো তিনি লিখেছিলেন জাপানি দার্শনিক শেইরি শিনোহারাকে। মৃত্যুর এক বছর আগে লেখা চিঠিগুলো সম্প্রতি পারমাণবিক বোমা ফেলার ৬০ বছর পূর্তি পালন উপলক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে। শেইরি শিনোহারার বিধবা পত্নী সম্প্রতি এগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন।

আইনস্টাইন বরাবরই পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। শিনোহারাকে লেখা চিঠিতেও তা বার কয়েক জানিয়ে দিয়েছেন। বিশ্বজুড়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল কাম্য। শিনোহারার সঙ্গে তার পত্র যোগাযোগের সূচনা ঘটে ১৯৫৩ সালে। সে সময় শিনোহারা আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে একজন পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে আইনস্টাইন ভূমিকার সমালোচনা করে চিঠি লিখেন। শিনাহারার চিঠির উত্তরে আইনস্টাইন জানাচ্ছেন 'জাপানে আণবিক বোমা ফেলার ঘটনাকে আমি সব সময়ে নিন্দা করে এসেছি। কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক ও পাগলামিপূর্ণ সিদ্ধান্তে আমার কিছুই করার ছিল না।'

টাইপ করা এই চিঠি ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন শিনোহারাকে উদ্দেশ করে লেখেন আইনস্টাইন। আণবিক বোমায় হিরোশিমার প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার লোক মারা যায়। আর নাগাসাকিতে মারা যায় ৭০ হাজারের ওপরে। এ বোমা হামলার ৬ দিন পরে জাপানি সম্রাট হিরোহিতো জাপানের আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করেন।

শিনোহারাকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে আইনস্টাইন বলেন, 'আমি কখনো লিখিনি যে আমি একশ' ভাগ শান্তিকামী। তবে আমি সব সময়ের জন্য শান্তিবাদকে উৎসাহিত করে গেছি। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে আমি শক্তি প্রয়োগের কথা বলেছি হয়তো। আর আমার বিরোধী পক্ষরা একে অস্ত্র করে আমাকে এবং আমার পক্ষের লোকদের চরিত্র ধ্বংস করতে মাঠে নেমেছে। হ্যাঁ, এটা সত্য, আমি নাজী জার্মানির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের পক্ষে ছিলাম। তাও পরিস্থিতির তুল্যমূল্যে যাচাই এবং প্রয়োজনীয়তার খাতিরে।'

আইনস্টাইনের সঙ্গে শিনোহারার চিঠি চালাচালির ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যায় ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে। এর এক বছর পর আইনস্টাইন শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর নানা অপকর্মের কথা এখন জানা যাচ্ছে। অনেক গবেষক ও ইতিহাসবিদ এ নিয়ে কাজ করছেন। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি সেগুলোর কিছু কিছু উল্লেখ করছি। তাহলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন মিত্রবাহিনীর বর্বরতার যথার্থ স্বরূপ। প্রথমেই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক রিচার্ড ড্রেটনের একটি লেখার অনুবাদ পেশ করা হলো। লেখাটি ইন্টারনেট সূত্রে পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে আমেরিকাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে সরাসরি অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরে নেতাজী সুভাষের সঙ্গে আলাপ করে তিনি তাঁর ভুল স্বীকার করেন এবং তাঁর সচিব কবি অমিয় চক্রবর্তীর মাধ্যমে জানান যে, তিনি বিশ্বযুদ্ধের বিবদমান কোনো পক্ষকেই সমর্থন করেন না। আমেরিকাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করাটা তাঁর ভুল হয়ে গেছে।

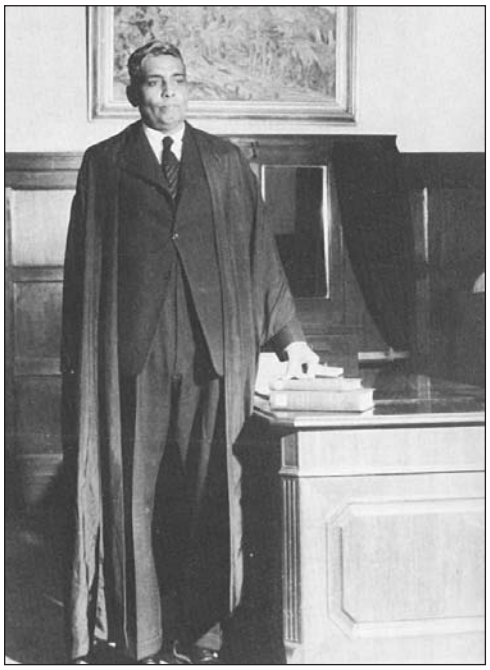

রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য ভালো, তাঁর ডাকে আমেরিকা যে কতটা ভয়ঙ্কর রূপে সাড়া দিয়েছিলো, তা তাঁকে নিজচোখে দেখে যেতে হয়নি। তাঁর প্রিয় 'দেশনায়ক' নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবরটিও তাঁকে শুনতে হয়নি। তিনি ১৯৪১ সালে মারা যান। কিন্তু আইনস্টাইন হিরোশিমা ও নাগাসাকির দগ্ধ স্মৃতি বুকে নিয়ে একযুগেরও অধিককাল বেঁচে ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির প্রধান শরিক আমেরিকার নেতৃত্বদানকারী তৎকালীন **'বিগ বয়'রা** তাদের নব-আবিষ্কৃত পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন পরমাণু অস্ত্রটির জন্য 'লিটল বয়' নামটিকে কেন বেছে নিয়েছিলেন? 'উপহাস/বিদ্রূপ' এরকম কিছু সমার্থক শব্দ দিয়েই শুধু ঐরকম নামকরণের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আজ পর্যন্ত মানবজাতি যুদ্ধবাজ আমেরিকার ঐ বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট ধিক্কার জানাতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না। আরও অনেক বেশি ধিক্কার ও কিছু প্রতীকী শাস্তি তার প্রাপ্য। ঐ জঘন্য অপরাধের জন্য আমেরিকাকে বিচারের সম্মুখীন না করা পর্যন্ত পৃথিবী পাপমুক্ত হবে না বলেই আমি মনে করি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে পরাজিত জাপানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য যে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়েছিলো, তার অন্যতম বিচারক ছিলেন ড. রাধাবিনোদ পাল। তিনি এরকম একটি রায়ই দিয়েছিলেন, যা আমেরিকানরা দীর্ঘদিন বিশ্ববাসীকে জানতে দেয়নি। কৃতী বাঙালি, বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল তাঁর ঐ ঐতিহাসিক রায়ের কারণে শুধু যে জাপানিদের মধ্যেই অমর হয়ে আছেন তা নয়, একজন স্বাধীনচিত্তের বিচারক হিসেবে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসেও স্থান করে নিয়েছেন।

ড. রাধাবিনোদ পাল আমেরিকাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেব চিহ্নিত করেছিলেন তখন, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের সকল কৃতিত্ব আত্মসাৎ করে সে নিজেকে বিশ্বের রক্ষাকর্তা বা ত্রাতা হিসেবে তার দাবিকে উচ্চে তুলে ধরে বিশ্বগ্রাসের ছক কষতে শুরু করেছিলেন। সেই দিক থেকে ড. রাধাবিনোদ পালের ঐ রায় ছিলো অত্যন্ত যুগান্তকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

বাঙালি যে নেতৃত্বে পাকা সেটা বুঝিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু , জাপানিরা যাঁকে 'চন্দ্র বোস' নামে শ্রদ্ধা করে; আইনস্টাইনের যোগ্য সহযোগী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সত্যেন বসু প্রমাণ করেছেন বাঙালি অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যায়ও পারদর্শী, কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, আর বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে, বাঙালি বিচার-বুদ্ধিতেও যথেষ্ট এগিয়ে।

ivawe‡bv` cvj

নিজে কখনও শিশু ছিলাম, সত্য হলেও এ-কথা ভাবতে আমি কিছুটা লজ্জিত বোধ করি। তাই শিশু শব্দটি ব্যবহার না করে, ছোট শব্দটি ব্যবহার করলাম। এমন দাবি করবো না যে, তখন বড় থাকলে, আমেরিকার পরমাণু বোমার আঘাত থেকে আমি বাঁচাতে পারতাম হিরোশিমাকে। তবে এটা ঠিক, তখন বড় থাকলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ-মার্কিন জোটকে নয়, বন্দি ভারতমাতাকে ব্রিটিশের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিই আমি সমর্থন জানাতাম। আমার বাবার মতো আমিও সমর্থন করতাম জাপানকেই। আমার বাবা ভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। তবে ছিলেন ঠিক ততদিনই, যতদিন ভারতীয় কংগ্রেসে ছিলো নেতাজী সুভাষের কংগ্রেস। গান্ধী-নেহরুর কংগ্রেস নয়। নেতাজী নেই তো আমার বাবাও নেই। আর খুব স্বভাবিকভাবেই আমার বাবা নেই, তো আমিও নেই।

সেই হিরোশিমা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য-অন্তিম মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অন্ধকারে রেখে, মরহুম চার্চিলের অনুমোদনক্রমে পরিচালিত ইঙ্গ-মার্কিন বর্বরতার চিরসাক্ষী, হিরোশিমা।

এতোদিন শুনিয়াছি নাম, এবার নিজের চোখে দেখিয়া এলাম।

প্রথমবার ২০০৩ সালের আগস্টে জাপানে গিয়েছিলাম, কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে হিরোশিমায় যেতে পারিনি। ছয় মাসের ব্যবধানে সম্পন্ন আমার দ্বিতীয় জাপান-ভ্রমণের সুযোগে (১৫ মার্চ--১৬ মার্চ, ২০০৪) সেই অপরাধ মোচন করা গেলো।

১৫ মার্চের গোধূলিলগ্নে জাপানের বুলেট ট্রেনে (জাপানি ভাষায় সিনকানসেন) চড়ে আমি জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োটো থেকে হিরোশিমা রেলস্টেশনে পৌঁছাই। আমাকে সেই বিরাট রেলস্টেশন থেকে যথাসময়ে উদ্ধার করতে উপস্থিত হয় মিজান। মিজানকে আমি চিনি না, ফোনে তার সঙ্গে কথা হয়েছে বেশ ক'বার। কণ্ঠস্বর থেকে ঝরে পড়া আন্তরিকতার টানে মিজানের একটা হাসি-খুশি চেহারা আমি কল্পনায় তৈরি করে নিয়েছি। মিজানের বড় ভাই ডা. আবদুর রহমান পাখি আমার অত্যন্ত প্রীতিভাজন। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে যখন সে পড়াশোনা করতো, তখন আমাদের ধোপাখোলার বাসায় প্রায়ই আসতো। পাখির বিয়েতেও আমি গিয়েছিলাম। সেই ডা. পাখির ছোট ভাই মিজান। বাংলাদেশে প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং ও পরে এমবিএ করে এখন জাপানের নামকরা মোটর নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান 'মাজদা'য় কর্মরত। মিজানের স্ত্রী ডেইজীও উচ্চশিক্ষিতা। ওরা দু'জনই আমার কবিতার ভক্ত। আমাকে আগেরবারই ডেইজী হিরোশিমায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তখন যাওয়া হয়নি। এবার হিরোশিমায় যাচ্ছি। ওরা দুজনই আমাকে ওদের দূর পরবাসে কিছু সময়ের জন্য কাছে পাবে ভেবে খুব খুশি।

১৩ মার্চ ছিলো সিজৌকার আন্তর্জাতিক ভাষা স্কুলের (ককুসাই কটুবা গাকুইন) বার্ষিক সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান। ঐ অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ অতিথি হয়েই আমি জাপান গিয়েছিলাম। সিজৌকার একটি চমৎকার মিলনায়তনে অনুষ্ঠানটি হয়। সেখানে আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখি এবং আমার 'কসাই' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাই। ছোট্ট কবিতা। সিজৌকার ভাষা স্কুলের প্রিন্সিপাল, সুদর্শনা হাগামাদা ইয়াসুকু আমার কবিতাটি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করে শোনালে জাপানি শ্রোতারা বেশ আনন্দ পান বলেই মনে হলো। তারা বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাততালি দিয়ে আমার প্রতি সম্মান দেখান।

১৪ মার্চ আমাকে সাথে নিয়ে ভাষা স্কুলের মালিক মি সুয়েৎসুগো দুপুরের দিকে বুলেট ট্রেনে রওয়ানা হন জাপানের প্রাচীন রাজধানী

কিয়োটোর উদ্দেশে।

আমরা কিয়োটো নগরীতে রাত কাটিয়ে, পরদিন ভোরে কিয়োটোর কিছু দর্শনীয় স্থান দেখে, পরে বিকেলের বুলেট ট্রেনে হিরোশিমা যাবো। কিয়োটোতে আমরা সেইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি। আমরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে তৈরি করা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চমৎকার অতিথিশালায় রাত্রিবাস করবো। সেইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক মি. নাকাও হাজিমি আমাকে উপহার দেন ডা. হাচ্ছির লেখা 'হিরোশিমা ডাইরি'। জাপানিদের মুখে দাড়ি খুব সহজলভ্য নয়। কিন্তু সেইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকের মুখে বেশ চমৎকার সাদা-কালো দাড়ি। তাই আমার সাদা চুল-দাড়ির সঙ্গে ভদ্রলোকের বেশ ভাব জমে গেলো। তারপর যখন জানলাম যে, তিনি দীর্ঘদিন আমেরিকায় থেকে এসেছেন এবং মার্কিন বিট কবি অ্যালেন গিনসবার্গের সঙ্গে তাঁর বেশ বন্ধুভাব ছিলো, তখন আমরা গিনসবার্গের সূত্রে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লাম।

আমি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য আমার 'সিলেকটেড পোয়েমস'-এর একটি কপি তাঁকে উপহার দিলাম। আর তিনি আমাকে যুদ্ধোত্তর জাপানি কবিতার একটি সংকলন ও ডা. মিচিহিকো হাচ্ছির লেখা 'হিরোশিমা ডাইরি' বইটি উপহার দিলেন। হিরোশিমা যাবার পূর্বমুহূর্তে বইটি পেয়ে আমার খুবই কাজে লাগলো। অনেক অজানা তথ্য জানতে পেলাম। হিরোশিমার একটি হাসপাতালে কর্মরত, পরমাণু

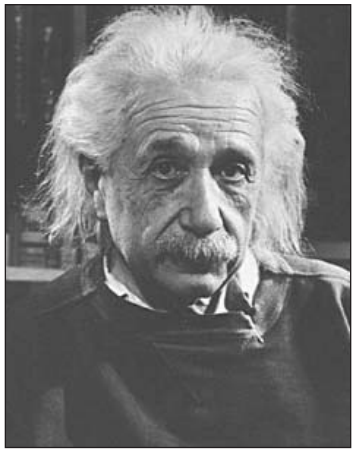

AvBb÷vBb

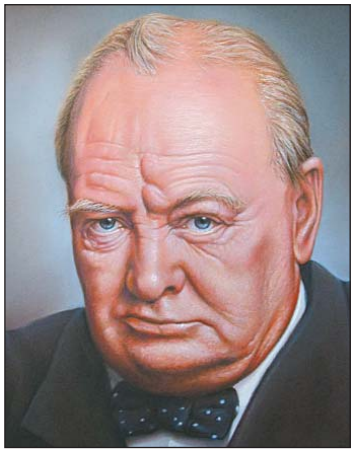

PwPj

বোমার আঘাত সয়েও অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া ডা. হাচ্ছি ৬ আগস্ট ১৯৪৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ পর্যন্ত তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন ঐ বইটিতে। পরে ১৯৫০ সালে হিরোশিমায় পরমাণু বোমার আঘাতে পঙ্গু হয়ে যাওয়া জাপানিদের মধ্যে কাজ করতে আসা একজন আমেরিকান ডাক্তার ওয়ার্নার ওয়েলস ডা. হাচ্ছির লেখা দিনলিপি আকারে রচিত বইটি জাপানি ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত এই দুর্লভ বইটির প্রকাশকাল ১৯৫৫ সাল।

ভারতীয় লেখক-কবি বিক্রম শেঠের নির্বাচিত কাব্যসংকলনে আমি তাঁর লেখা একটি কবিতা পড়েছিলাম। কবিতাটির নাম ৬ আগস্ট ১৯৪৫। ডা. হাচ্ছির দিনলিপিটি পাঠ করে জানলাম, কবি বিক্রম শেঠ তাঁর ঐ বিখ্যাত কবিতাটির সকল তথ্য-উপাত্ত ও ভাব হাচ্ছির লেখা 'হিরোশিমা ডাইরি' থেকে নির্বিচারে স্বীকৃতিহীনভাবে ব্যবহার করেছেন। কী আশ্চর্য! তাতে বোঝা যায় যে, ডা. হাচ্ছির লেখা বইটি পাঠকচিত্তে কী অনতিক্রম্য ও অমোচনীয় প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম।

আমার হোস্ট সিজুকার আন্তর্জাতিক ভাষা স্কুলের মালিক মি. সুয়েৎসুগো আমাকে ১৫ হাজার ইয়েন দিয়ে কিয়োটো-হিরোশিমা এবং হিরোশিমা-সিজুকার সিনকানসেনের অগ্রিম টিকিট কিনে দিয়ে দুপুরের দিকে কিয়োটো থেকে সিজুকায় ফিরে গিয়েছেন। আর বিকেলের দিকে আমাকে হিরোশিমামুখী বুলেট-ট্রেনে তুলে দিলো বাংলাদেশের তরুণ শিল্পী মনিরুজ্জামান শিপু। শিপু কোত্থেকে? শিপু ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনিমেশন ফিল্মের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি করছে। শিপুর সঙ্গে মিজান ও ডেইজীর মুঠোফোনে কথা হয়। স্থির হয়, আমি একাই যাবো হিরোশিমায়। মিজান আমাকে হিরোশিমা রেলস্টেশন থেকে খুঁজে নেবে।

জাপানে ভয়ের কিছু নেই। জাপানে কেউ হারায় না, কিছু হারায় না। আমার ব্যাগটি ট্রেনে রেখে আমি নেমে গিয়েছিলাম সিজুকায়। ঐ ব্যাগ চলে যায় ট্রেনের অন্তিম গন্তব্য ওসাকায়। অন্য যেকোনো দেশে হলে ভয় পেতাম, কিন্তু জাপান বলেই ভয় পাইনি। জানি, আমার ব্যাগ কেউ ধরবেও না। টাকাভর্তি মানিব্যাগ যেখানে ফেরত পাওয়া যায়, সেখানে আমি অকারণে হারাবার ভয় পাবো কেন?

ফোনে ওসাকা স্টেশনের সঙ্গে কথা হয় আমার ব্যাগের ব্যাপারে। পাসপোর্ট-ভিসা আর বিমান-টিকিটসহ আমার ব্যাগ যথারীতি ওসাকায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের শিল্পী শিপু ওসাকা থেকে কিয়োটোতে আবির্ভূত হয়েছিল আমার ঐ হারানো ব্যাগটি সঙ্গে নিয়েই।

আমি বহু দেশ ঘুরেছি, ইংরেজিতে কথা বলতে পারি। আমার পক্ষে হারানোর জন্য পৃথিবীটা খুব না হলেও বেশ ছোটই মনে হয়। আমাকে অনেকের ভিড়েও আবিষ্কার করা সম্ভব। জাপানিদের মুখে দাড়ি না থাকায়, জাপানে আমাকে খুঁজে পাওয়াটা আরও সহজ। ফলে হিরোশিমা রেলস্টেশনে খুব সহজেই , মিজান আমাকে পেয়ে গেলো। এর আগে মিজান আমাকে শুধু ছবিতেই দেখেছে। মিজানের প্রাণখোলা হাসিমুখ দেখে আমিও শনাক্ত করতে পারলাম, ও যথার্থই ডা. আবদুর রহমান পাখির ভাই। কোনো ভুয়া লোক আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না। জানলাম, সিরাজুল আলম খানকেও সে একবার হিরোশিমা স্টেশন থেকে আমার মতোই নির্ভুল তুলে নিয়েছিল। এ কাজে সে বেশ অভিজ্ঞ।

হিরোশিমা থেকে একটা লোকাল ট্রেন ধরে আমরা একেবারে মিজানের বাসার কাছের স্টেশনে গিয়ে নামলাম। জায়গাটার নাম নাকানো, আকি-কু। কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে মিজানের দোতলা বাসা। ডেইজীর হাসিমুখ, ওদের ছোট মেয়েটির সান্ধ্যকালীন কান্না আর ওদের বছর দশেকের ছেলেটির সদ্য শেখা ভব্যতার নিদর্শন হিসেবে প্রদত্ত আস্সালামুআলাইকুমের মধ্যে সম্পন্ন হলো আমার হিরোশিমায় গৃহপ্রবেশ পর্ব। অনেক দিন পর ইসলামী কায়দায় সম্মান প্রদর্শন করার মতো শুভ্রশ্মশ্রুমন্ডিত একজন যথার্থ মৌলানাকে হাতের কাছে পাওয়ায় মিজানের ছেলেকে খুব খুশি বলে মনে হলো। তা না হলে আমাকে সে এতো ঘন-ঘন স্লামালাইকুম দিতো না।

নিচের তলায় আমার রাত্রিবাসের চমৎকার ব্যবস্থা। কফি খেতে খেতে ভাবছিলাম, হিরোশিমায় যারা আমার সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী, তারা মিজানের বাসাতেই নিশ্চয় আসবে। এখানেই জমপেশ আড্ডা হবে রাতে। আর বাইরে বেরুতে হবে না। কিন্তু না। মিজান বললো, আমরা আপনাকে নিয়ে অন্য একটা জায়গায় যাবো, জায়গাটা শহরের মাঝখানে। ওখানে আরও কয়েকজন আসবে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে। আমার বাসাটা শহরের এক প্রান্তে। তা না হলে আমার বাসাতেই সবাইকে আসতে বলতাম। ওখানেই আমাদের ডিনার হবে। তা ছাড়া আসা-যাওয়ার পথে রাতের হিরোশিমা শহরটাও আপনার কিছুটা দেখা হয়ে যাবে।

শরীরে না ধরলেও মিজানের প্রস্তাব আমার খুবই মনে ধরলো। কাল সকালের দিকে পরমাণু বোমার ধ্বংস-স্মারক দর্শন করে, বিকেলের দিকে সিজুকায় ফিরে যাবো। রাতের হিরোশিমা নগরী দেখার আর সুযোগ হবে না। তার চেয়ে যতটা সম্ভব সময়ের সদ্ব্যবহার করাটাই উচিত হবে। সময় নষ্ট না করে দ্রুতই বেরিয়ে পড়লাম হিরোশিমার পথে।

মিজানের গাড়ি ছুটে চলেছে আলোকোজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন এমন এক আশ্চর্য রূপসী নগরীর বুক চিরে, কে বলবে এই নগরীর নামই হিরোশিমা? যে দিকে তাকাই, চোখে পড়ে সুন্দর, কেবলই সুন্দর। আনন্দে মন ভরে যায়। বুঝতে পারলাম, জাপানিরা তাদের সমস্ত প্রযুক্তিশক্তি, সুন্দরের অনুভূতি ও পরাজয়ের মর্মবেদনাকে মুক্তি দিয়েছে তাদের অন্তরের সবচেয়ে বড় ক্ষতস্থানটিতে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এটমবোমা ফেলে আমেরিকা যে-নগরীটিকে জাপানের মানচিত্র থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল,

জাপানিরা সেই নগরীটিকেই পরিণত করতে চেয়েছে পরমাণু ভস্মের ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানো জাপানিদের অদম্যশক্তির প্রতীক-নগরীতে।

হিরোশিমার স্কাইলাইন দেখে মনে হলো এ-নগরী যেন জাপানের নয়, আমেরিকা বা ইউরোপের। আমরা যাবো নাকা-কু। মিজানের বাসা আকি-কু থেকে বিশ কিলোমিটারের পথ। এর মধ্যেই বেশ কিছু ব্রিজ পড়লো পথে। নিচের টলটলে নদীজলে বিদ্যুতের আলোয় সজ্জিত নিশি-হিরোশিমার কম্পমান ছায়া।

g I jvbv Avej Kvjvg AvRv`

Ug¨vb

চোখের তৃষা না মিটতেই ফুরিয়ে গেলো আমাদের পথ। আমাদের গাড়ি দাঁড়ালো মার্কিনি আদলে গড়া একটা চমৎকার ছয়তলা বাড়ির সামনে। ঐ বাড়ির সর্বোচ্চ তলায় বাস করেন এক তরুণ আমেরিকান বাঙালি, নাম কাজী ইসলাম। ডাক নাম দিপু। আসার পথে মিজান ও ডেইজীর মুখে এই কাজী দম্পতির অনেক প্রশংসা শুনেছি। কাজীর স্ত্রীর নাম রিয়া। কাজী ইসলাম ফোর্ড কোম্পানিতে কাজ করেন। মিজান মাজদায়। এই দুটি বড় কোম্পানি এখন জয়েন্ট ভেঞ্চারে মিলিতভাবে গাড়ি তৈরি করছে বিশ্ববাজারে আরও বেশি করে আধিপত্য বিস্তারের আশায়।

কাজী দম্পতি নিচে নেমে এসে আমাদের হাসিমুখে স্বাগত জানালেন। পাঁচতলায় একটি মস্তোবড় ফ্ল্যাটে থাকেন এই নবদম্পতি। সদ্যবিবাহিত বলে মনে হয়। মনে হয় মেইড ফর ইচ আদার। ফ্ল্যাটটি চমৎকার সাজানো-গোছানো। ঢাকার বড়লোকদের বাড়িঘরের মতো। আরামপ্রদ সোফায় গা গড়িয়ে আর পা ছড়িয়ে বসতে পারলাম। বেশ কিছুদিন পর মাথা উঁচু করে হাঁটতে পেরে খুব ভালো লাগলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিরোশিমা নগরীর অনেকটাই দেখা যায়। ভারি সুন্দর লাগে।

ফ্ল্যাটের পাশ দিয়েই বয়ে চলে গেছে কিয়োবাশি-গাওয়া। গাওয়া মানে নদী। নদীর ওপর একটু পরে পরে ব্রিজ। জাপানে নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা বড় মধুর। ব্রিজের পর ব্রিজ তৈরি করে ওরা নদীর দুই তীরকে এমনভাবে যুক্ত করে দিয়েছে যে, নদীর সামনে এসে কীভাবে পার হবো এ-ভবনদী?--ভেবে বাঙালির মতো জাপানিরা থমকে দাঁড়ায় না। কখনও কখনও মনে হয় বুঝিবা ব্রিজটাই পুরনো, নদীটা নতুন।

এরই মধ্যে পরিচয় হলো ডেন্টিস্ট জয়নাল আবেদীন ও তার স্ত্রী ফারজানার সঙ্গে। মুজিবুর রহমান ও উনার স্ত্রী আরিফার সঙ্গে। আরও একজন ডেন্টিস্ট এসেছিলেন, নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। সম্ভবত মিলন। ঢাকার বংশালে ওনার একটি ডেন্টাল ক্লিনিক আছে। মুজিবুর স্ট্যাটিসটিকসে পিএইচডি করছে। মনবসু স্কলারশিপ নিয়ে জাপানে পড়তে এসেছে। জাপানে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে আসা আর চাকরি করার মধ্যে খুব পার্থক্য নেই। বৃত্তির পাওয়া অর্থ থেকে প্রতি মাসে বেশ কিছু অর্থ বাঁচে।

গৃহকর্তা কাজী ইসলামের ডাক নাম দিপু। দিপু জন্মসূত্রে বাংলাদেশের বাঙালি হলেও এখন তিনি আমেরিকার নাগরিক। ফার্স্ট জেনারেশন আমেরিকান-বাঙালি। ফোর্ড কোম্পানিতে কাজ নিয়ে এখন আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে কিছুদিন ধরে জাপানের হিরোশিমায় কোম্পানির দেয়া ফ্ল্যাটে রাজার হালে আছেন। বুঝলাম বিশেষ প্রতিভা না থাকলে ফোর্ড কোম্পানি এমন তরুণকে এরকম লোভনীয় চাকরি দিতো না।

পরদিন ভোরে ঐ দিপু আর দিপুর সুদর্শনা পত্নী রিয়াই আমাকে মিজানের বাসা থেকে তুলে নিয়ে গেলো হিরোশিমার এটমিক ডৌম বা পিস মেমোরিয়াল দেখাতে। আমরা যতই এটমিক ডৌমের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, লক্ষ করলাম, ততই আমার রক্তচাপ বাড়ছে। কিন্তু সংরক্ষিত এলাকার ভিতরে প্রবেশ করে আমার মনটা কিন্তু বেশ দমে গেলো। মনে হলো এ আমি কোথায় এলাম? বই পড়ে, ছবি দেখে হিরোশিমার যে ছবি আমার বুকের ভিতরে আঁকা হয়ে আছে, বাস্তবে দেখা হিরোশিমার মধ্যে আমি তাকে যেন খুঁজে পেলাম না। কয়েক ঘন্টা ধরে আমরা ঘুরে ঘুরে আমেরিকার আঁকা গোয়ার্নিকাটি দেখলাম। কিন্তু আমার মনে হলো হিরোশিমা নেই হিরোশিমাতেই। প্রশ্ন জেগেছে মনে, তবে কি জাপানিরা তাদের পরাজিত অতীতের দগ্ধস্মৃতিকে ভুলে থাকতে চেয়েছে? 'কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?'

আমি হিরোশিমার এটমিক ডৌম ও পিস মেমোরিয়ালের বিস্তৃত বর্ণনা অবান্তর ভেবে এখানে দিলাম না। কেননা, এটম বোমার আঘাতে চোখের পলকে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া হিরোশিমা নগরীর হাল কী হয়েছিলো, ঐ প্রজ্বলিত নগরীর নিরস্ত্র নিরীহ বেসামরিক অধিবাসীরা কীভাবে সেদিন করুণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলো, সে কথা কমবেশি অনেকেরই পড়া আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বর্বরতা ও কূটনৈতিক জালিয়াতির কিছু প্রমাণ, যা আমি বিভিন্ন সময়ে ইন্টারনেট সুত্রে পেয়েছি, তা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমার মনে হয় তাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য যথেষ্ট সঙ্গত কারণ পাঠক পাবেন। বিজয়ীরা নিজেদের দায়মুক্ত করার জন্য তাদের মতো করেই ইতিহাস রচনা করে। এই কথাটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের বেলায় যতটা খাটে, ততটা বোধকরি আর কোথাও নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ের আনন্দে বিভোর তৎকালীন বিশ্বের রাজনীতিবিদ ও মহান মনীষীরা জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমায় আমেরিকার পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিন্দা জানাতে ভুলে গিয়ে এমন একটা মহা-অন্যায়কে সেদিন প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, যা কোনো আবস্থাতেই কোনো বিবেকবান সভ্য-মানুষের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে না। অক্ষশক্তির বর্বরতার কাহিনী আমরা অনেক পড়েছি। পড়তে বাধ্য করা হয়েছে আমাদের। কিন্তু মিত্রবাহিনীর বর্বরতার কাহিনী আমরা বেশি জানতে পারিনি। বিজয়ীরা বিচার করেছে বলেই তাদের নিজেদের অপরাধের বিচার হয়নি আজও। যদিও আমি মনে করি, সে সময় ফুরিয়ে যায়নি এখনও। বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পালের মতো বিচারকরা আবারও আসবেন, তখন কে জানে হয়তো একদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও ট্রুমান, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্টালিনেরও বিচার হবে। হতেই হবে। তা না হলে পৃথিবী পাপমুক্ত হবে না।

আমি এবার আমার সংগৃহীত কিছু তথ্য ও মতামতের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

নৈতিকতা বিবর্জিত ফাঁকা বুলি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ-আমেরিকান মিথলজি হচ্ছে অ্যাংলো-আমেরিকান যুদ্ধবাজদের আড়াল করা। ১৯৪৫ সাল। সব ফ্রন্টেই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘন্টা বেজে গেছে। মিত্রবাহিনী বিজয়ী শক্তি। তারা তাদের পছন্দ মাফিক রচনা করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। সে সময়কার নেতৃবৃন্দ তাদের মৃত্যুর পরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যান সে সময়ে চালানো প্রোপাগান্ডার ফলে।

এইতো সেদিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সে সময়কার

নেতাদের মহান দেশপ্রেমিক যোদ্ধা অভিহিত করে তাদেরকে রাশিয়ার রাজনৈতিক সম্পদ বলে মন্তব্য করেন। ব্রিটেন ও আমেরিকায়ও এরকমটির দেখা মেলে। তারাও প্রবল উৎসাহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি ধরে রেখেছে। কিন্তু ঘটনার আড়ালে থেকে গেছে অন্য কথকতা।

পাঁচ বছর আগের কথা। রবার্ট লিলি নামের একজন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী সামরিক বাহিনীর নথি থেকে তথ্য নিয়ে একটি বই লেখেন। বইটিতে দেখানো হয়েছে ১৯৪২-৪৫ সাল সময়কালে মার্কিন সৈন্যদের ধর্ষণ সংক্রান্ত নানা বিবরণী। রবার্ট লিলি ২০০১ সালে তার পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য জমা দেন। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় মার্কিন ওই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটির উৎসাহে ভাটা পড়ে। পরে ২০০৩ সালে বইটি ফরাসি অনুবাদে প্রকাশিত হয়।

রেড আর্মিদের ধর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনার কথা অ্যান্থনি বেভরের লেখার মাধ্যমে আগেই জানা গিয়েছিল। এবার জানা গেল ব্রিটিশ আমেরিকান সৈন্যদের কথা। লিলির বক্তব্য হচ্ছে, কমপক্ষে ১০ হাজারের মতো আমেরিকান-ধর্ষণ এ সময়ে সংঘটিত হয়। যদিও সমসাময়িক আরো অনেক যৌন অপরাধের ঘটনা আড়ালে থেকে গেছে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের টাইম ম্যাগাজিনে রিপোর্ট প্রকাশ হয় : 'আমাদের মার্কিন বাহিনী আর ব্রিটিশ বাহিনী ধর্ষণ ও লুটতরাজ চালিয়ে আমাদের সে অপরাধের অংশ করে নিয়েছে।... আমরা সৈন্যদেরকে ধর্ষক বাহিনী বলেই বিবেচনা করছি।'

এখন পর্যন্ত ব্রিটেন ও আমেরিকার লোকেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিজেদের গৌরবময় ভূমিকার কথা স্মরণ করে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই সে জেল্লাদার ভূমিকার ভিতর থেকেই দৈত্য বের হয়ে আসে। যদিও সিনেমা, জনপ্রিয় ইতিহাস, গল্পগাথা এবং রাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অ্যাংলো-আমেরিকান সাহসিকতাকেই তুলে ধরা হয়। তবে রেড আর্মির কেন্দ্রীয় ভূমিকা অবশ্য এখন বিস্মৃতপ্রায়। অধিকাংশের বিশ্বাসে যুক্ত ছিল গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ। যুদ্ধ করে আমেরিকানরা যে বিশ্বকে মুক্ত করেছে এ বিশ্বাসও তাদের মনে জোরালো। যেমনটি রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একজন গুণমুগ্ধ মি. নীল ফার্গুসন। তার বক্তব্য হচ্ছে এ যুদ্ধের মাধ্যমে তারা চিরকাল 'সুবোধ বালক' (the good guys) হিসেবেই চিহ্নিত হবে।

তবে যারা প্রকৃত ইতিহাসের খবর রাখেন তাদের কাছে এগুলো তামাশা হিসেবে বিবেচিত হবে। হিটলারের বিরুদ্ধে 'শুভ যুদ্ধের' ৬০ বছর পূর্তি পালন হচ্ছে। এখন এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে নৈতিকতা বিবর্জিত ফাঁপা বুলির নামান্তর। অবশ্যই তা ব্রিটিশ ও আমেরিকার জন্য। তাদের নীতি ও নৈতিকতা যে অসাড় তা প্রমাণ হচ্ছে দিন দিন। ফ্যাসিজম প্রতিহত করার নামে যততত্র বোমা ফেলা, মানুষকে পঙ্গু করে দেয়া বিনা বিচারে আটক করে রাখার অধিকার সত্যি দুঃখজনক।

নরিগা, মিলোসভিচ, সাদ্দাম ছিল আমেরিকার এক সময়কার বন্ধু। যদিও তারা ছিল স্বৈরশাসক। তাদের পতন ঘটানোর জন্য মার্কিনিরা তাদের নাম দেয় নতুন 'হিটলার' বলে। তারপর তাদের বিরুদ্ধে শুভ যুদ্ধ শুরু করি। তাছাড়া সার্বিয়া কিংবা ইরাকে বেসামরিক জনগণকে হত্যা, আবু গারিব কিংবা গুয়ানতানামো নির্মমতা, ফুলুজায় যুদ্ধাপরাধ সবই আমেরিকা করে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য। আর এ সবই হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল্য।

মার্কিন গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ ভুলে যেতে পছন্দ করে ফ্যাসিজমকে, যা ছিল অ্যাংলো-আমেরিকানের একটি গুরত্বপূর্ণ ভিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে হিটলারের স্বপ্নকে প্ররোচিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ব ইউরোপে নাজিদের আশা ছিল এটি তাদের আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় পরিণত করবে। এজন্য এখানে তারা জাতিগত শুদ্ধিকরণ অভিযান চালিয়েছিল এবং ক্রীতদাসের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আর পশ্চিম ইউরোপকে পরিণত করতে চেয়েছিল আরেক ভারত উপমহাদেশে; যেখান থেকে রাজস্ব, শ্রমিক এবং সৈন্যসামন্তের যোগান নিশ্চিত হবে। যেটা ব্রিটিশরা ভারতে করেছিল। জার্মানি আর জাপান তাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে যা করেছিল, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ল্যাটিন আমেরিকায় সেই নজিরই স্থাপন করেছে। ব্রিটিশ আমেরিকান তত্ত্বগুলো একই উৎস থেকে উদ্ভূত এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদমুক্ত থাকার জন্য তা সশ্রদ্ধ। যদিও নির্যাতন ক্যাম্প ব্রিটিশদেরই আবিষ্কার। ইরাক ও আফগানিস্তানে গোষ্ঠীগত প্রতিরোধ প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশরাই প্রথম আকাশশক্তি ব্যবহার করে।

আমরা ভুলে গেছি যে, ব্রিটিশ এবং আমেরিকার অভিজাত ধনী ব্যক্তিরা ফ্যাসিস্টদের সাহায্য করেছিল। প্রেসিডেন্ট বুশের দাদা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে শত্রুদের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে গেছেন।

তাছাড়া অনেক বিত্তবান ও প্রভাবশালী অ্যাংলো-আমেরিকান, যারা মুসোলিনি এবং হিটলারকে বেশ পছন্দ করতেন এবং তাদের সাহায্য করেছেন। হেনরি ফোর্ড হিটলারের জন্মদিনে ৫০ হাজার মার্ক উপহার হিসেবে পাঠান। আমরা খুব কম পরিমাণই স্মরণ রাখতে পছন্দ করি যে, আমাদের তরফেও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছিল।

১৯৪০ সালের ড্রেসডেন শহর ধ্বংসের কথা একবার স্মরণ করুন। মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ আর আহত লোকে ভরে ছিল শহরটি। এখানে কোনো সামরিক সমাবেশ ছিল না। আর এখানেই কিনা আমাদের বোমারু বিমানগুলো বোমা ফেলে। যুদ্ধে আটক লোকদের বিরুদ্ধে জাপানিদের নানা কুকীর্তির কথা আমাদের জানা। কিন্তু আমাদের হাতে আটকে পড়া জাপানিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নির্যাতন এবং হত্যার হদিস আমরা ক'জনইবা জানি। ১৯৪৬ সালে শান্তিকামী যুদ্ধ-সংবাদদাতা এডগার

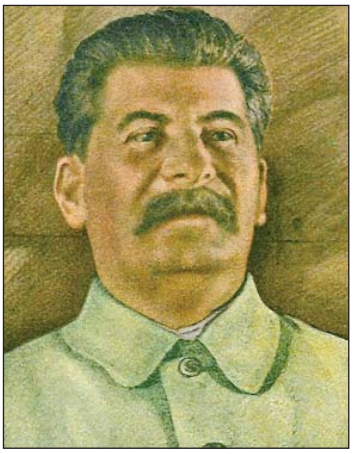

÷wjb

†Zv‡Rv

জেনেস লেখেন, আমরা বন্দিদের জমাটবাঁধা রক্তের ছবি নিই। আরো নিই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া আহত বন্দি এবং তাদের লাইফবোটের ওপর ফেলা বোমাবর্ষণের ছবি। নিই আহত শত্রুদের গায়েব করে দেয়ার কিছু দৃশ্য বন্দি করি ক্যামেরায়। তাছাড়া শত্রুদের করোটি দিয়ে টেবিল সাজিয়ে রাখার দৃশ্যও আমাদের চোখে পড়ে সে সময়।

১৯৪৫ সালের পরে, আমরা অনেক ফ্যাসিস্ট পদ্ধতি তাদের কাছে ধার করেছি। নুরেমবার্গে অপরাধীদের শুধুমাত্র হাতে ধরে শাস্তি দেয়া হতো। যদিও বেশির ভাগ আমাদের সহায়তায় ছাড়া পেয়েছে। ১৯৪৬ সালে ১ হাজার নাজি বিজ্ঞানীদের প্রজেক্ট পেপার ক্লিপ গোপনে আমেরিকায় স্থানান্তর করা হয়। এসব বিজ্ঞানীদের মধ্যে কার্ট বুম ছিলেন। বুম নার্ভ গ্যাসের বিষয়টি পরীক্ষা করেছিলেন। ছিলেন কোনরাড শেফারও, যিনি Dacha-এ অপরাধীদের ওপর রাসায়নিক যৌগ (Salf) প্রয়োগ করতেন। অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে ছিল ওষুধ ও সার্জারির মাধ্যমে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি। এটি সিআইএ পরে তাদের প্রজেক্ট বুবার্ডে অন্তর্ভুক্ত করে। জাপানের শিরো আইসির বায়ো অস্ত্রের পরীক্ষার গোপন দলিলটিও আমেরিকা গোপনে পাচার করে নিজ দেশে নিয়ে যায়। শিরো তার এ অস্ত্রটি মানচুরিয়ার বন্দিদের ওপর প্রয়োগ করেছিলেন। মাত্র এক দশকের মধ্যেই ব্রিটিশ সৈন্যরা কেনিয়ায় তাদের নির্যাতন সেলে এটি প্রয়োগ করে। ফ্রান্স গেস্টাপোর নির্যাতন কৌশল প্রয়োগ করে

আলজিরিয়ার ওপর। আমেরিকা লাতিন আমেরিকার অনেক দেশেই এটি প্রয়োগ করে ৬০-৭০ দশকে। কিউবা এবং ডিয়াগো গার্সিয়ায় আমেরিকান ক্যাম্পগুলোতে এগুলো তার সম্প্রসারিত রূপ নিয়ে আজো বহাল আছে।

যুদ্ধটা হলো বর্বর আর নৃশংসতার মুহূর্ত মাত্র। এর মূল বিষয়ই হচ্ছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আপন স্বার্থ উদ্ধার, যা আমেরিকান সৈন্যরা এখন বেশ দাপটের সঙ্গে দেখিয়ে দিচ্ছে। যদিও মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের সৈন্যদের যৌন অপরাধকে একটু শিথিলভাবেই নিচ্ছেন। আমরা যদি নাৎসিবাদের দৈত্যকে স্মরণ করে যারা তাদের নির্মূলে অবদান রেখেছে তাদের উৎসাহিত করি, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আমরা কম পরিমাণই আত্মতৃপ্তি পেতে পারি। আমাদের বিশ্বাস, যদি সমসাময়িক যুদ্ধবাজ ব্যক্তিদের নিক্তি-পাল্লায় বিচার করা হয়, তবে এ নিয়ে আমাদের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকবে।

হিরোশিমার এবং নাগাসাকি

মার্কিন আণবিক বোমার কূটনীতি একটি আণবিক অপরাধ।

'আণবিক বোমা ব্যবহারের জন্য আমাদের চড়া দাম দিতে হবে। আমরা এখন ব্র্যান্ডেড জানোয়ার।' (নিউইয়র্ক টাইমস মিলিটারি

gnvZ¥v MvÜx

†bZvRx mfvI P›` em

অবজারভার)

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের ৬ এবং ৯ তারিখে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহরে মার্কিন বাহিনী পারমাণবিক বোমা ফেলে। যদিও এখানে বোমা ফেলার মতো কোনো সামরিক কারণ ছিল না। এ ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মন্তব্য হচ্ছে : 'আমি সনদপত্র দিচ্ছি না যে, এই বোমা আমাদের বিজয় এনে দিয়েছে। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে যুদ্ধকে চটজলদি শেষ করার জন্য এটির প্রয়োজন ছিল। আমরা জানি যে এই পথে আমরা কয়েক হাজার আমেরিকান ও মিত্রবাহিনীর সৈন্যের জীবন রক্ষা করেছি। বোমা ব্যবহার করা না হলে এরা নিশ্চিত মারা যেত।'

(মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান, অক্টোবর ৩, ১৯৪৫)

হিরোশিমা ও নাগাসাকির ২ লাখ ৪৭ হাজার নিরপরাধ লোককে বোমার আগুনে পুড়িয়ে কয়েক হাজার মার্কিন ও মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের রক্ষার যৌক্তিকতা কতটুকু? কোনো যৌক্তিকতাই ছিল না। মার্কিন মেজর জেনারেল সি. চেনল্টের বক্তব্য তেমনটি বলছে, 'জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর অংশগ্রহণই নিশ্চিতভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ডেকে আনতো। বোমা ফেলা না হলেও একই ফলাফল আসতো।

(নিউইয়র্ক টাইমস আগস্ট ১৫, ১৯৪৫)

এদিকে রুজভেল্ট ১৯৪৩ সালের শুরুতেই উপলব্ধি করেছিলেন :

'জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া যদি মিত্রবাহিনীতে অংশ নেয়, তবে যুদ্ধ খুব কম সময়ে শেষ হয়ে যেতে পারে। এতে জীবননাশের বিষয়টি যেমন কমবে, তেমনি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিও কমানো যাবে।'

(রুজভেল্টের কুইবেক কনফারেন্স দলিল, রাশিয়ার অবস্থান)

মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট স্টেনিনাস বলছেন একই কথা। তার বক্তব্য হলো :

'রাশিয়া ছাড়া জাপানে আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রের মিলিয়ন পরিমাণ প্রাণহানি ঘটতে পারে।'

(মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট স্টেনিনাস)

আমেরিকান সমালোচক বলে পরিচিত নরম্যান কাজিনস এবং টমাস ফিনলেটারের মন্তব্য হচ্ছে :

'আমরা কেন বোমা ফেলেছি? কেনইবা আমরা মিত্রবাহিনীর শক্তির সদ্ব্যবহার করিনি? শুধু কি এটা প্রচণ্ড কার্যকারিতা দেখাতে? এ জন্য এর ভিত্তিতেই কি জাপানকে আলটিমেটাম (সময়সীমা) বেঁধে দেয়া হয়েছিল তাদের দায়িত্ববোধ দেখাতে? এর উত্তর যেকোনো কিছুই হতে পারে। যদি বোমা ফেলাটাই লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে জাপানকে আক্রমণের আগে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধের অংশ করতে পারতাম। সে ক্ষেত্রে অবশ্য পরীক্ষা চালানোর কোনো জায়গা মিলতো না।'

(সানডে রিভিউ, জুন ১৫, ১৯৪৬)

আণবিক বোমার উৎপাদন ক্ষেত্র ম্যানহ্যাটন প্রজেক্টের সামরিক পরিচালক জেনারেল গ্রোভস বলেছেন:

'আমি দায়িত্ব নেয়ার দু' সপ্তাহেরও বেশি সময় হাতে ছিল না, আমার ভূমিকায় কোনো বিভ্রান্তি নেই। কিন্তু রাশিয়া ছিল আমাদের শত্রু। প্রজেক্টটি চলছিল এর ভিত্তিতেই। তবে আমি সেখানে একাই যাবো না, যেখানে আমাদের রাশিয়ার মতো সাহসী মিত্র ছিল। আমি সব সময় তাদের সন্দেহ করতাম এবং এর ভিত্তিতেই প্রজেক্ট চলতো।'

(জেনারেল গ্রেভেস, ম্যানহ্যাটন প্রজেক্ট পরিচালক)

অধ্যাপক যোশেফ রটবাট জানাচ্ছেন :

'১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে আমার একটি অস্বাভাবিক আঘাত (Shock) পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে, যখন ম্যানহ্যাটন প্রজেক্টের পরিচালক গ্রোভস আমাকে জানান, বোমাটি তৈরি করা হচ্ছে মূলত রাশিয়াকে এক হাত দেখিয়ে দেয়ার জন্য।'

(অধ্যাপক যোশেফ রটবাট, দ্য টাইমস জুলাই ১৭, ১৯৮৫)

মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট বাইনেস জানাচ্ছেন একই কথা। তার বক্তব্য হচ্ছে :

'যুদ্ধে জয়লাভের জন্য জাপানের দুটি শহরে বোমা ফেলার কোনো দরকারই ছিল না। আমাদের লক্ষ্য ছিল অন্যত্র। রাশিয়া, বিশেষ করে ইউরোপকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসা।'

(মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট জেমস বাইনেস)

ব্রিটিশ অধ্যাপক পিএমএস ব্যাকেটের মন্তব্য হচ্ছে :

'আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আণবিক বোমা ফেলার ঘটনাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সামরিক কর্মকান্ডই ছিল না। এটি ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ শুরুর প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।'

(অধ্যাপক পি. ব্যাকেট 'দ্য মিলিটারি অ্যান্ড পলিটিক্যাল কনসিকুয়েন্স অব অ্যাটমিক এনার্জি') চার্চিল ও 'দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে লিখেছেন : 'এটা ধরে নেয়া ভুল হবে যে আণবিক বোমার গ্লানি জাপানের কপালে লেখা ছিল। কেননা, তাদের নিশ্চিত পরাজয়ের পূর্বেই আণবিক বোমা ফেলা হয়।'

(উইনস্টোন চার্চিল 'দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার')

আণবিক বোমা তৈরির পরিকল্পনার শুরুর দিকে চার্চিল এতে ছিলেন। ওই সময়ে তিনি এই মিথ প্রচারে সাহায্য করেছিলেন :

'অন্যান্য বিষয় থেকে আণবিক বোমার বিষয়টি একটু বেশিই ফ্যাক্টর এই কারণে যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দ্রুত শেষ করতে এটি কার্যকর হবে।

(উইনস্টোন চার্চিল, হাউস অব কমন্স, আগস্ট ১৭, ১৯৪৫)

এদিকে মার্কিন সেক্রেটারি ফর ওয়ার হেনরি স্টিমসন তার রোজনামচায় আণবিক বোমা সম্পর্কে লিখেছেন : 'এটি ছিল রাশিয়াকে প্ররোচিত করা, বলটি নিয়ে খেলাও।'

মার্কিন সেক্রেটারি ফর ওয়ার হেনরি স্টিমসনের কাছে থেকে

আণবিক বোমা জাপানে ব্যবহার করা হবে, এমনটি শুনে আইসেন হাওয়ার বলেন :

'আমার বক্তব্য তাকে বলা ছিল অপাত্রে দান। প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল, জাপান ইতিমধ্যে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। সেখানে বোমা ফেলা হবে একদমই অপ্রয়োজনীয় একটি বিষয়।... সে সময় জাপান আত্মসমর্পণের ছুঁতা খুঁজছিল।' পরে তিনি আরো বলেন, 'জাপানে আণবিক বোমা আক্রমণের কোনো যুক্তিসম্মত কারণই ছিল না।' মিত্রবাহিনী ইয়েলটায় (Yalta) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন শরিক হবে। এবং এ ক্ষেত্রে তারা মানচুরিয়া দিয়ে জাপানে প্রবেশ করবে। ততদিনে অবশ্য জার্মান ইউরোপ ফ্রন্টে পরাজয় মেনে নিয়েছে। জার্মানির আত্মসমর্পণের দিনক্ষণ হচ্ছে ১৯৪৫ সালের ৮ মে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমণের দিনক্ষণ নির্ধারিত ছিল ৮ আগস্ট ১৯৪৫ সাল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের আগেই তারা আত্মসমর্পণ করে। চার্চিল একে বলেছেন: '... মার্শাল স্ট্যালিন এবং তার মেধাবী সামরিক বাহিনীর বিশ্বস্ততা ও সময়ানুবর্তিতার অন্য রকম একটি উদাহরণ, যা তারা সব সময়ের জন্য রাখত।'

হিরোশিমায় নেতাজীদর্শন

নির্মলেন্দু গুণ

Even the playground was packed with
the dead and dying.
They looked like so many cod fish
spread out for drying.

Hiroshima Diary :
7 August 1945
by Michihiko
Hachiya, M.D

হয়তো-বা কোনো একদিন
হিরোশিমাকে নিয়ে
এই কবিতাটি লিখবো বলেই,
আমি জন্মেছিলাম ১৯৪৫-এ
অখণ্ড ভারতবর্ষে--;
নেতাজী সুভাষ বসুর বাংলায়।

আমি এই সত্য বুঝেছিলাম
সেই বিষণ্ন গোধূলিতে--;
যখন হিরোশিমা স্টেশনে
আমাকে নামিয়ে দিয়েছিলো
বুলেটগতির সিনকানসেন।
কবে থেকে অপেক্ষায় আছি,
এতোদিন পরে এলে, কবি?
এসো, আমার ঘরে এসো।
যাও দেখো, তারপর লেখো
তোমার ঐ-প্রার্থিত কবিতাটি।
এই কথা বলে একটি অচিন
পাখি উড়ে গেলো,--যেনো
আমি তার আত্মার আত্মীয়।

রাত্রি অবসানে, পরদিন ভোরে
আমি ছুটলাম আমেরিকার
শ্রেষ্ঠ-পুরাকীর্তি, দ্য লিটল বয়
বিরচিত মহা-শ্মশান দর্শনে।

মানুষ কতটা অমানুষ হতে পারে,
সভ্যরা কতো অসভ্য হতে পারে,
আমেরিকা কী নিষ্ঠুর হতে পারে--,
আমি দেখলাম, শুধু দেখলাম...।

হিরোশিমা, হায় হিরোশিমা--
তুমি কি কেবলই ছবি?
শুধু পটে লিখা, পিকাসোর
আঁকা বীভৎস গোয়ার্নিকা?
অথচ কী এক আশ্চর্য বিভ্রম!
এটমিক ডৌম দর্শনের পরে,
'ওতাগাওয়া'র তীরে দাঁড়িয়ে
আমার কেনো যে বারবার
তাঁর কথাই মনে পড়লো শুধু।
কেন যে মনে পড়লো? কেন?

মনে হলো আমি খুব স্পষ্টই
দেখতে পেলাম তাঁর মরদেহ,
ইতিহাস যাঁর সন্ধানে এখনও
হাতড়ে বেড়াচ্ছে এ-চরাচর।

অক্ষঃশক্তির অমিত শক্তিকে
সুকৌশলে ব্যবহার ক'রে
মুক্ত-স্বাধীন-অখন্ড ভারতবর্ষ
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বুকে নিয়ে,
দীর্ঘ যাত্রা শেষে
সপ্ত সিন্ধু পাড়ি দিয়ে এসে
যিনি সওয়ার হয়েছিলেন
বীর্যবান জাপানি ঘোড়ায়।

স্মৃতিঘরের ছবির ভিতরেও
আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম,
পিকা-ডনে ঝলসে যাওয়া
লৌহপিন্ডের মত নেতাজীর
দোমড়ানো-মোচড়ানো দেহ।

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম,
সামরিক-পোশাক-পরিহিত
সেই দুঃসাহসী মানুষটিকে-
আমি যাঁর নাম দিয়েছিলাম
২য় বিশ্বযুদ্ধের ব্যর্থ-অর্জুন।

আমি দেখতে পেলাম আইওই
ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে, বিধ্বস্ত
এটমিক ডৌমের দিকে তাকিয়ে
জয়ের হাসি হাসছেন কতিপয়
বিশ্বনেতা, যাদের মধ্যে আছেন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট মি. ট্রুম্যান,
ব্রিটেনের চুরট-চার্চিল, ভারতের
গান্ধী-নেহরু-মাওলানা আজাদ
এবং শ্রীমতী মাউন্ট ব্যাটেনও।
অশ্রুসিক্ত চোখের কারণে আমি
বাকিদের ভালো চিনতে পারিনি।

'স্ট্যালিন কই? কোথায় স্ট্যালিন?'
এই প্রশ্ন করে নেতাদের ঘিরে
তখন
হিরোশিমার ব্যথিত আকাশ জুড়ে
উড়ছিলো কিছু হতবাক
পাঁতিকাক।

আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলাম,
পরমাণু-ভস্মের ভিতরে একাকার
হয়ে আছে নেতাজীর স্বপ্ন-ভস্ম--,
আর শান্তি-মূর্তির নিচে দাঁড়ানো
মাওলানা আজাদের চোখে জল।

21

the hot ground ground's
burning memory—
end of the war-day

tsuchi atsuku yaki I shi
kioku shusenbi
– Kinichi

যুদ্ধ অবসান
দগ্ধ ক্ষত স্মৃতিময়
তপ্ত পদতল।

(উইনস্টোন চার্চিল, হাউস অব কমন্স)

কিন্তু মার্কিনিদের প্রয়োজন ছিল জাপানকে তাদের নিজেদের হাতে আত্মসমর্পণ করানোর। তাদের হাতে কোনো সময় ছিল না আণবিক বোমাকে অন্য কোথাও পরীক্ষা করানোর। কোরে নামের সামরিক নিশানাটি ২০ মাইল দূরে থাকলেও সেখানে প্রচলিত বোমা মেরে ধ্বংস করা হয়েছিল। এবং স্থান হিসেবে যথার্থ ছিল না। এদিকে হিরোশিমা ধ্বংসবিহীন নিশানা হলেও তা ছিল বেসামরিক লোকজনে পূর্ণ। আর এটিকেই মার্কিনিরা নিশানা করে ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালে আণবিক বোমা ফেলে এর সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করে।

'এটা পরিষ্কার যে, আণবিক বোমা ফেলা ছাড়াও আকাশপথে জাপানের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা গিয়েছিল বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে। তাছাড়া এ আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে তারা পরিত্রাণের পথ খুঁজছিল। ...বিস্তারিত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এটা বলা যায় যে, ডিসেম্বরের ৩১ তারিখের পূর্বেই জাপান আত্মসমর্পণ করতো। এর জন্য আণবিক বোমা ফেলার দরকার পড়ত না। এমনকি এজন্য রাশিয়াকেও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন হতো না।

(মার্কিন স্টট্যাজিক বোম্বিং সার্ভে ৪, প্যাসিফিক যুদ্ধের প্রতিবেদনের সারাংশ)

'১৬ জুলাই তারিখে নিউ মেক্সিকোতে বোমা তৈরির কাজ সম্পন্ন হবার পর হাতে তেমন সময় ছিল না। অন্যদিকে ৮ আগস্ট ছিল রাশিয়ার দেয়া সময়সীমা। আমাদের জন্য খুব কম সময় ছিল আণবিক বোমা পরীক্ষা সম্পন্ন করার। এদিকে রাশিয়া জাপানে প্রবেশ করলে বোমা ফেলা কঠিন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। আর তাই রাশিয়া জাপানে ঢোকার আগেই যা কিছু করার করে ফেলা হয়।

(টমাস কে ফিনলেটার মার্কিন এয়ার পলিসি কমিটির সভাপতি)

জাপান সত্যিকারভাবেই ছিল পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে। এমনকি তারা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিল। এ কাজে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে মধ্যস্থতা করতে বলেছিল। এ প্রস্তাব তারা ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের শুরুতেই দিয়েছিল।

এদিকে জুলাই মাসের শুরুর দিকে আমেরিকা জাপানের ওপর পারমাণবিক বোমা ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। জাপানকে জুলাই মাসের ২২ তারিখে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হয়।

'... ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের শুরুর দিকে জাপানের বিরুদ্ধে আণবিক বোমা ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রথম আণবিক বোমাটি ফেলা হয় ৬ আগস্টে। এবং আত্মসমর্পণের সময়সীমা নতুন করে বেঁধে দেয়া হয় ১০ আগস্ট পর্যন্ত।

(এটলি, নিউজ ক্রনিকল, ডিসেম্বর ৫, ১৯৪৬)

মার্কিনি কর্তৃপক্ষ পোটসডামাকে ২৮ জুলাইয়ে জানায় যে, বোমা ব্যবহারের পূর্বে জাপান আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ নিয়ে মিত্রপক্ষের নেতাদের কথোপকথনটি ছিল এমন :

স্ট্যালিন : আমি সবাইকে জানাতে চাই যে, রাশিয়ান প্রতিনিধির মাধ্যমে আমরা জাপানের কাছ থেকে একটি নতুন প্রস্তাব পেয়েছি... জাপান আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাইছে। আমরাও শেষ মুহূর্তে তাদের সাহায্য করার কথা জানিয়ে দিয়েছি।

ট্রুম্যান : আমরা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি না।

এটনি : আমরা রাজি।

(পোটস্ডাম কনফারেন্স, জুলাই ২৮, ১৯৪৫)

এদিকে জাপানে এ প্রচারণা প্রবলভাবেই ছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয়ার কারণে তাদের ওপর পরমাণু বোমা ফেলা হবে।

'ইতিমধ্যে সরকারের মধ্যে তাড়াহুড়া পড়ে গিয়েছিল আণবিক আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে। রাশিয়াকে তারা যে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ করেছিল তা তারা ভুলেই গিয়েছিল...

জোরালো দাবি হচ্ছে, জাপানে বোমাটি টেনে আনার কারণ ছিল যুদ্ধ দ্রুত শেষ করে দেয়া। এটাকেই মিথ্যে পরিণত করা হয়েছে। অথচ আমরা জানি, বোমা ফেলার সপ্তাহখানেক পূর্বেই সম্রাট হিরোহিতো স্ট্যালিনকে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ করেছিলেন এবং খোলাখুলিভাবে আত্মসমর্পণের ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন। তাছাড়া জাপানের নৌবহর অ্যাংলো-আমেরিকান নৌ যোগাযোগ দিয়ে ব্যাহত হচ্ছিল। আবার তাদের সৈন্যদের ঘরে ফেরাও দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছিল।'

(দ্য টাইমস আগস্ট ১৬, ১৯৪৫)

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির খবর জাপানকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। সে সময়কার জাপানের প্রধানমন্ত্রী কানতার সুজুকির বক্তব্যে রয়েছে তার সুস্পষ্ট আভাস : 'যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির খবর আমাদের একেবারেই আশাহত অবস্থায় ফেলে এবং আরো যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে অসম্ভব করে তোলে।'

(জাপানের প্রধানমন্ত্রী কানতার সুজুকি, আগস্ট ৯, ১৯৪৫)

তবে আকস্মিকভাবে বোমা ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি ছিল? এ নিয়ে জানাচ্ছেন মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট জেমস বাইনেস। তার বক্তব্য হচ্ছে, 'রাশিয়ানদের আসার আগেই আমরা চেয়েছি আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে।

আমেরিকার পারমাণবিক বোমা বানানোর পরিকল্পনা সম্পর্কে চার্চিল অবগত ছিলেন। কিন্তু তারা ইউএসএসআরের কাছ থেকে এটিকে আড়াল করতে চেয়েছেন। এমনকি যুদ্ধের আরেক নেতা স্ট্যালিনকেও এটি সম্পর্কে অন্ধকারে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এ নিয়ে চার্চিল জানান:

'আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে চুক্তিবদ্ধ ছিলাম যে পারমাণবিক বোমার বিষয়টি গোপন রাখবো। যদিও আমরা জানতাম তিন-চার বছরের মধ্যে পারমাণবিক বোমার উন্নয়নে যথেষ্ট অগ্রগতি হবে। এবং অনেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধরে ফেলবে।

(উইনস্টোন চার্চিল, আগস্ট ১৬, ১৯৪৫)

সবশেষে মার্কিনিদের ইচ্ছে ছিল জাপান ইউএসএসআরের কাছে আত্মসমর্পণ করুক। তারা এটাও চেয়েছিল যে জাপানি জনগণ যেন সমাজতন্ত্র গ্রহণের কোনো সুযোগ না পায়। এ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তার ডায়েরিতে লিখেছেন : জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ নিয়ে আমরা সত্যিই উদ্বিগ্ন। পোটসডামের অভিজ্ঞতা আমাকে এই প্রতীতি দিয়েছে যে, জাপানের কোনো অংশ নিয়ন্ত্রণে রাশিয়াকে কিছুতেই অনুমোদন করা যাবে না।

(মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ডায়েরি, জুলাই ১৯৪৫)

আবার ওই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায়নি, রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক। চার্চিল এমন কথাই জানিয়েছেন অন্য এক জায়গায়।

চার্চিলের চিফ অব স্টাফ ফিল্ড মার্শাল লর্ড অ্যালান ব্রুক চার্চিলের যুদ্ধ দিনের ডায়েরি নিয়ে কথা প্রসঙ্গে জানান,

'জাপানের যুদ্ধে রাশিয়া আসার কোনো দরকার ছিল না। পারমাণবিক বোমার মতো নতুন বিস্ফোরকটিই এ যুদ্ধ মিটমাট করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাছাড়া রাশিয়ার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার রসদও আমাদের হাতে মজুদ ছিল।

জাপানকে নিয়ে আমেরিকার আরেকটি ভয় ছিল- দেশটি বুঝি রাশিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজতন্ত্রী হয়ে যায়। বিষয়টার চমৎকার একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আলেক্সজান্ডার ওয়ার্থ :

'৬ আগস্টে তাড়াহুড়া করে বোমা ফেলার কারণ ছিল, ট্রুম্যান চেয়েছিলেন রাশিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বেই যেন বোমা ফেলা হয়। তবে এটাই কিন্তু সব কথার শেষ কথা নয়। অন্যত্র লুকানো রয়েছে আরো গোপন কথা। বোমা ফেলা হয়েছিল ট্রুম্যান, বাইনেস, স্টিমসন এবং অন্যদের প্রত্যক্ষ মদদে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকান শক্তি সম্পর্কে রাশিয়াকে অবগত করানো। জাপানের যুদ্ধ স্বাভাবিক গতিতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে এশিয়ায় রাশিয়ানদের আগমন ঠেকানো সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া ইউরোপেও তাদের মোকাবিলা সহজসাধ্য হয়েছিল।

(ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আলেক্সজান্ডার ওয়ার্থ 'রাশিয়া অ্যাট ওয়ার')

আর তাই মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট জেমস বাইনেসের গর্ব ভরা মন্তব্য : এই বোমা নিক্ষেপের ঘটনাই যুদ্ধ শেষে আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

যুদ্ধে যে এই বিপুল পরিমাণ নিরপরাধ মানুষ মারা গেল, ব্যাপারটিকে

আমেরিকা সব সময়ে রাজনৈতিক লেবাস পরাতে চেয়েছে। এটা তারা করেছে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই। তাছাড়া সেদিনের ঘটনায় যেসব মানুষ ও সম্পদ বেঁচে গিয়েছিল, তাদের ওপর পড়েছে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব। যদিও এ ঘটনার ডাক্তারি পরীক্ষাগুলো মার্কিনিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব রয়ে গিয়েছে কয়েক প্রজন্ম ধরে। আর এই হিবাকুশা নামের এক জাপানির মন্তব্য, হিরোশিমার আণবিক বোমাকে আমি বহন করে যাচ্ছি আজো।

১৯৪৫ সালে আগস্টের ৬ তারিখে হিরোশিমায় যে বোমাটি ফেলা হয়, সেটি ছিল ১ কিলোমিটার ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ। কিন্তু তার ছিল ১৩ হাজার টন টিএনটি ক্ষমতাসম্পন্ন। শব্দের গতির চেয়েও দ্রুতগতিতে এটি হিরোশিমায় ফেটেছিল। ফেটে পড়ার কেন্দ্রের উত্তাপ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ২ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এ পরিমাণ উত্তাপ ৬০০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া এটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দালানকোঠা ঘরবাড়ি মানুষসহ হিরোশিমার সবকিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল।

Victims of the US atomic crime; not only were theof Hiroshima and Nagasaki 'liberated' from the choice of opting for socialism or capitalism by being burnt alive; but more importantly: they were the expendable guinea pigs in the firstacts of the Cold War.

British school and college history syllabus teaching anddo not contain any of this information. All theand information I have presented here is readily available to historians, writers, journalists, teachers, educators and syllabus publishers. Although I have spent many hundreds of hours gathering it all together, I did not have to look very far to find any of it.

১৯৪৫ সালের ৪-১১ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েতের ক্রিমিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল ও সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন যখন মিলিত হয়েছিলেন, তখন দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর মিত্রবাহিনীর ত্রিরত্ন এই মর্মে একমত হয়েছিলেন যে, ফ্রান্সসহ মিত্রবাহিনী জার্মান দখল করবে–, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানে প্রবেশ করবে। ১৯০৪ সালে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়েছিলো। জাপানের কাছে রাশিয়ার সেই আপমানজনক পরাজয়ের বদলা নেবার জন্য সুযোগের সন্ধানে থাকা রুশরা হিটলারকে পরাভূত করে যখন জাপানে প্রবেশ করার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এনেছিলো, তখন ক্রিমিয়া চুক্তি ভঙ্গ করে হিরোশিমায় পরমাণু বোমা বর্ষণের আগেই আমেরিকা কার্যত জাপান দখলের পাঁয়তারা শুরু করে দেয়। মিত্রবাহিনীর ক্রিমিয়া-সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জাপান অবহিত ছিলো কি না, তা জানা না গেলেও, জাপান যে সোভিয়েতের সঙ্গে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো, সে সম্পর্কে তথ্য মিলেছে। তার মানে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমলগ্নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জয়ের কৃতিত্ব সোভিয়েতের হাত থেকে ছিনতাই করে নেয় আমেরিকা। আমেরিকা বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নেয়। আমাদের গ্রাম্য-প্রবচনের ভাষায় একেই বলে 'তাওয়া গরম করে আবদুল আর রোটি সেঁকে জব্বার।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট ১৯৪৫ সালের ১২ এপ্রিল আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। ইতিমধ্যে এটমবোমা তৈরি করা সারা। ওই জগৎধ্বংসী পরমাণু-বোমা ব্যবহারের স্নায়ুচাপ সহ্য করতে না পেরেই মনে হয় রবীন্দ্রভক্ত রুজভেল্ট [১৯১৭ সালে আমেরিকা ভ্রমণের সময় নিউ ইয়র্কের গভর্নর হিসেবে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন] মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে ভেবেছিলেন। রুজভেল্ট তো একদিন মরতেনই, সময়োচিত মৃত্যু রুজভেল্টকে বরং বাঁচিয়ে দেয়। তিনি মরে বাঁচেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন। রুজভেল্টের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই পরাজয় নিশ্চিত জেনে এডলফ হিটলার আত্মহত্যা করেন ৩০ এপ্রিল। জার্মানি আত্মসমর্পণ করে ৭ মে। জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের ঘোষণা না দিলেও, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়ে যোগাযোগ শুরু করে।

এই যখন অবস্থা, ঠিক তখনই চার্চিল ছাড়া পুরো বিশ্বকে অন্ধকারে রেখে আমেরিকা ৬ আগস্ট সকাল সোয়া আট ঘটিকায় জাপানের হিরোশিমা নগরীতে পৃথিবীর প্রথম ইউরেনিয়ামজাত পরমাণু বোমা আমেরিকার ভাষায় 'লিটল বয়'-এর সফল বিস্ফোরণ ঘটায়। হিরোশিমার তেজস্ক্রিয় রশ্মি আকাশে মিলাতে না মিলাতেই, দু'দিনের ব্যবধানে আমেরিকা পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা মাফিক প্লুটোনিয়াম সমৃদ্ধ দ্বিতীয় পরমাণু বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটায় নাগাসাকি নগরীতে। মার্কিন হিসাবমতেই বোমা বর্ষণের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হিরোশিমায় ৭৫,০০০ হাজার ও নাগাসাকিতে ৪০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়। নগরী দু'টি মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

তার মানে হলো, হিটলারের মৃত্যুর ৯৬ দিনের মাথায়, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান জাপানে পরমাণু বোমা বর্ষণের নির্দেশপত্রে স্বাক্ষর দান করে তাঁর চেয়েও অনেক বেশি বর্বর, অনেক বেশি নিষ্ঠুর হিটলার হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করেন। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে পৃথিবীকে হিটলারের হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছিলো বলে যারা দাবি করেছিলেন, করেন– আমি উচ্চকণ্ঠে তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। মনে করি, অতঃপর জার্মানির হিটলার, ইতালির মুসোলিনি ও জাপানের জেনারেল হিদেগি তোজোকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আর ততটা নিঃসঙ্গ মনে হবে না।

পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকাকে সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানোর পর নেতাজী সুভাচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। সুভাষের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভুল স্বীকার করে তাঁর সচিব কবি অমিয় চক্রবর্তীকে পত্র লেখেন। কবি অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন:

'সুভাষের বক্তব্য ছিলো এই যে, যুদ্ধশান্তির জন্য আমেরিকা দুই পক্ষকে নিবৃত্ত হতে বলুক।

রাশিয়া এবং আমেরিকা একত্র হয়ে যুদ্ধ রোধ করতে পারে–। এই হতো রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত বাণী।

ঐ সময়ে আমাকেও একটি দীর্ঘ পত্র লিখে জানান যে, তিনি যুদ্ধে কেনো পক্ষকেই সমর্থন করেন না। ঐতিহাসিক তথ্য রক্ষার জন্য এই ব্যাপার উল্লেখ করলাম।

কিছুদিন পরেই সুভাষচন্দ্রের উপর যবনিকা পতন হলো– তিনি নির দ্দেশ।

এখন একথা বলা যেতে পারে যে, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান সম্পর্কে ব্যাকুল হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্তসূত্রে খবর নেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে পারেন যে, নির্বিঘ্নে সুভাষচন্দ্র অন্য দেশে গিয়ে পৌঁছেছেন। আর কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানতে চাননি।'

[সুভাষ-স্মৃতি : 'সুভাষচন্দ্র' : অমিয় চক্রবর্তী]

মুক্ত-মনা ওয়েস সাইটে পরিবেশিত ব্রায়ান মিচেল ও সৈয়দ আসলাম প্রদত্ত প্রবন্ধ থেকে আমি আমার রচনার অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করেছি।

আমার রচিত 'পুনশ্চ জাপানযাত্র' বই থেকেও কিছু তথ্য গৃহীত হয়েছে।

ডবচারপতি রাধাবিনোদ পাল-এর দুর্লভ আলোকচিত্রটি জাপানে বসবাসরত তরুণ সাহিত্যিক-গবেষক প্রবীর বিকাশ সরকারের সৌজন্যে পাওয়া গেছে।

হিটলারের সঙ্গে আমার ছবিটি লন্ডনের মাদাম তুসোর মিউজিয়ামে তুলেছিলো আমার কন্যা মৃত্তিকা।

অন্যান্য ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত।

যুদ্ধ অবসান
দগ্ধ ক্ষত স্মৃতিময়
তপ্ত পদতল।
– এই জাপানি হাইকুটির রচয়িতা কিনিচি।